জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখদুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে। সেখানে বাদপ্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে?

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

১লা বৈশাখ

১৩২৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

এই গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশগুলি আচার্য
জগদীশচন্দ্রের রচনা হইতে সংকলিত।
অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি সম্বন্ধে
যথাস্থানে উল্লেখ কবা হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

প্রথম অধ্যায়

অদৃশ্য আলোক

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বসুর মৌলিক গবেষণাসমূহ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতি কর্মু লিখিয়াছিলেন :

"আপনার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষগণ মানব-সভ্যতার অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগৎ সমক্ষে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদিগের গৌরবকীর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন।"

জগদীশচন্দ্রের এই প্রথম বিস্ময়কর আবিষ্কারের আভাস পাইতে হইলে আমাদিগকে ইহার কিছু পূর্বেকার কয়েকটি কথা স্মরণ করিতে হইবে।

বিদ্যুৎ তরঙ্গ

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওএল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, যে ঈথর-তরঙ্গ দ্বারা আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি হয়, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সেই ঈথরের মধ্য দিয়াই পরিচালিত হইতে পারে। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা নয়, বিজ্ঞানকে গণিতের গণ্ডির মধ্যে ফেলিয়া ম্যাক্সওএল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে জার্মানিতে হার্জ যন্ত্রসহযোগে ম্যাক্সওএলের তথ্য অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। সমস্ত পৃথিবী

ব্যাপিয়া বিজ্ঞানীমহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ইহার দুই বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলেজে তাঁহার ক্লাসে ছাত্রদিগকে হার্জের এইসব পরীক্ষা দেখাইতে লাগিলেন।

পৃথিবীর উপরে বাতাস অল্পদূর গিয়া শেষ হইয়াছে, কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য-নক্ষত্র-তারকা হইতে আমরা আলো পাইতেছি। কিরূপে? বিজ্ঞানী কল্পনা করিলেন যে, জল স্থল বাতাস পরিব্যাপ্ত হইয়া এবং যেখানে জল স্থল বাতাস নাই সেই মহান্ শূন্য স্থানও ব্যাপিয়া একটা কিছু আছে। ইহার নাম দেওয়া হইল ঈথর। এই ঈথর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না শুধু এইটুকু ধরিয়া লওয়া হইল যে ইহা কাঁপে। তরঙ্গ উত্থিত হইলে সেই তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে এবং এই তরঙ্গ আমাদের চোখে পড়িয়া আমাদিগের আলোকের অনুভূতি জাগায়। কিন্তু এখানে একটা কথা আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, যেমন বায়ুর কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হইলে তবেই উহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দের অনুভূতি জাগায়, তেমনি ঈথরের সকল কম্পন দর্শনেন্দ্রিয়ে আলোকরূপে প্রতিভাত হয় না; কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমায় থাকিলে তবেই উহা আমাদিগের নিকট আলোক বলিয়া মনে হয়। সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটি কম্পন লাল আলো বলিয়া মনে হয়। ইহার দ্বিগুণ সংখ্যার কম্পন বেগনী আলো বলিয়া প্রতিভাত হয়। অন্যান্য রঙের আলোকের কম্পন-সংখ্যা এই দুই সীমার মধ্যে। কম্পন-সংখ্যার পরিবর্তে যদি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হিসাবে প্রকাশ করা যায় তো লাল রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইল একটা ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ আর বেগনী রঙের ইহারও অর্ধেক। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইল দুইটি পর পর তরঙ্গের মাথার মধ্যে দূরত্ব।

হার্জ তড়িতের সাহায্যে ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন করিলেন। সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কয়েকশত গজ। কিন্তু এ তরঙ্গ তো চোখে দেখা যাইবে না; এই অদৃশ্য আলোকের অস্তিত্ব তবে কিরূপে জানা যাইবে? হার্জ তাহারও এক ব্যবস্থা করিলেন। বিজ্ঞানের এক নূতন দিক হার্জ খুলিয়া দিলেন; কিন্তু খুলিয়া দিয়া বেশিদুর অগ্রসর হইবার পূর্বেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরের অধ্যায় আরম্ভ করিলেন জগদীশচন্দ্র।

দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক

হার্মোনিয়ম হইতে আমরা 'সা' স্বরও শুনিলাম 'রে'ও শুনিলাম, উভয়ই বাতাস-তরঙ্গ হইতে উত্থিত। প্রথমটার কম্পন-সংখ্যা কম, দ্বিতীয়টার বেশি। তেমনি হার্জের উদ্ভাবিত এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও সাধারণ আলোক উভয়ের গোত্র এক। উভয়ই ঈথর-তরঙ্গ, তবে বর্ণ বিভিন্ন, প্রথমটির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেশি, দ্বিতীয়টির কম। কিন্তু উভয়ে যে একগোত্রীয় তাহা প্রমাণ হইবে কিরূপে?

আলোকেব কতকগুলি ধর্ম আছে। প্রথম, আলোক সোজাপথে চলে; সোজাপথে চলে বলিয়া আলোক অনচ্ছ পদার্থের ছায়া ফেলে। দ্বিতীয়, আলোক প্রতিফলিত হয়। তৃতীয়, আলোকের প্রতিসরণ আছে; অর্থাৎ একটি স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোক বাঁকিয়া চলে। চতুর্থ, আলোক-তরঙ্গের কোন শৃঙ্খলা নাই; এই তরঙ্গগুলি কতক উপর-নিচে কতক ডাইনে-বামে এলোমেলোভাবে সবদিকে কম্পিত হইয়া চলে। কিন্তু কতকগুলি স্ফটিক আছে যাহার মধ্য দিয়া আলোক গেলে এই বহুমুখ কম্পন একমুখ হইয়া দাঁড়ায়।

হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন উহা যদি দৃশ্য আলোকের এক গোত্রীয় হয় তো দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক এক ধর্মীয় হইবে। দৃশ্য আলোকের কয়েকটি ধর্মের কথা তো দেখা গেল; এই

ধর্ম অদৃশ্য আলোকেও বিদ্যমান কি না হার্জ পরীক্ষায় মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হার্জের পরীক্ষায় অনেক বাধা দেখা দিল।

প্রথম, আলোক সোজা পথে অনচ্ছ পদার্থের পশ্চাতে যে ছায়া ফেলে হার্জের পরীক্ষায় তাহা দেখান সম্ভব নয়; সম্ভব যে নয় তাহার কারণ এই যে, যে-ঢেউএর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় তাহার ছায়া পড়ে না, যেমন জলের ঢেউয়ের সম্মুখে একখানা ছোট পাথর ধরিলে পাথরের পশ্চাতেও ঢেউ দেখা দেয়; আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট বলিয়া ছায়া পড়ে। হার্জের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড়, সুতরাং এই অদৃশ্য আলোক দ্বারা কোন অনচ্ছ পদার্থের পশ্চাতে ছায়াপাত পরীক্ষা সম্ভব নয়; প্রতিফলন, প্রতিসরণ পরীক্ষা হার্জ দেখাইলেন বটে কিন্তু এইসব পরীক্ষা বিশেষ সন্তোষজনক হইতে পারিল না। হার্জের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশি এই তো হইল প্রথম কারণ, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, যে-যন্ত্র এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবে তাহা সূক্ষ্ম ধরনের নয়; একটু দূরে রাখিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরা যায় না। জগদীশচন্দ্র হার্জের প্রবর্তিত যন্ত্রের দুইভাবে উন্নতি সাধন করিলেন। হার্জের বৈদ্যুতিক ঊর্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক গজ, আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত যন্ত্র হইতে যে বৈদ্যুতিক ঊর্মি বাহির হইয়া আসিল তাহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি অল্প, এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এই তরঙ্গ ধরিবার জন্য জগদীশচন্দ্র এক নূতন ধরনের উপায় অবলম্বন করিলেন। একখণ্ড গ্যালিনার (galena) উপর একটি সরু তার আসিয়া ঠেকিয়াছে, আর কিছু নয়, এই হইল ধরিবার যন্ত্র। এখানে বলা যাইতে পারে যে বর্তমান যুগে বিনা তারে বার্তা ধরিবার যে যুগান্তর আসিয়াছে তাহার মধ্যে ক্রিস্টাল সেটে (crystal set) তরঙ্গ ধরিবার ব্যবস্থায় জগদীশচন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্যালিনা ডিটেকটর (galena detector) ঠিক একইভাবে কাজ করিতেছে।

এইবার জগদীশচন্দ্র বিভিন্ন পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। যে লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উদ্ভব হইতেছিল তাহার মুখে একটি নল লাগাইয়া সেই নলের সম্মুখে সোজা লাইনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবার তাঁহার নূতন ধরনের যন্ত্র, কৃত্রিম চক্ষু, লাগাইয়া জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন যে ঐ চক্ষুর মধ্যে কাঁটা নড়িয়া উঠিল। এই কৃত্রিম চক্ষু একপাশে ধরিলেন উহাতে কোন উত্তেজনা-চিহ্ন দেখা গেল না। অতএব অদৃশ্য আলোক যে সরল পথে গমন করে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল। তাহার পর আলোক যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হয় এবং প্রতিফলিত রশ্মি কয়েকটি নিয়ম পালন করে, জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন অদৃশ্য আলোক ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। কাচের মধ্যে দিয়া যাইতে দৃশ্য আলোক যেমন বাঁকিয়া যায়, অদৃশ্য আলোকও তদনুরূপ করিল। কিন্তু এইসব পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। দৃশ্য আলোকের পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জল স্বচ্ছ, ইটপাটকেল অনচ্ছ, আলকাতরা তো বটেই। এই অদৃশ্য আলোক কিন্তু জলের মধ্য দিয়া যায় না, অথচ ইটপাটকেল, আলকাতরার মধ্য দিয়া অবাধে চলিয়া যায়।

দৃশ্য আলোক কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁকিয়া যায়, হীরকের মধ্যে ইহা আরও বেশি বাঁকে এবং এই কারণে আলোক ছড়াইয়া দিবার ক্ষমতা কাচ অপেক্ষা হীরকের বেশি। হীরকের ঔজ্জ্বল্যের ইহাই কারণ এবং তাই হীরকের এত মূল্য। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে, দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে হীরকের যে ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে চীনামাটির ক্ষমতা তদপেক্ষা অনেক বেশি। কল্পনায় মনে করা যাক যে এই অদৃশ্য আলোক একদিন মানবচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইল। তখন মানবের নিকট চীনাবাসন হীরক অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখাইবে।

ইহার পরের পরীক্ষা বিদ্বন্মণ্ডলীকে অত্যধিক বিস্মিত করিল। সাধারণ আলোক-তরঙ্গ সর্বমুখ, তবে টুর্মালিন প্রভৃতি স্ফটিকের ভিতর

দিয়া গেলে উহা একমুখ হইয়া বাহির হইয়া আসে। এই আলোর সম্মুখে যদি আর একখানি টুর্মালিন পূর্বের মত ধরা যায় তো ইহার মধ্য দিয়া ঐ আলো যাইবে; কিন্তু টুর্মালিনটা যদি আড় করিয়া, ৯০° ডিগ্রী ঘুরাইয়া, ধরা যায় তাহা হইলে আলো উহার ভিতর দিয়া যাইবে না। আলোর এই ধর্মটা বুঝাইতে জগদীশচন্দ্র একটা উপমা দিতেন। মনে করা যাক একটা ঘরে কতকগুলি বক ও কচ্ছপ আছে। বকগুলির দেহ উপর-নিচু লম্বমান আর কচ্ছপের দেহ আড়াআড়ি। ঘরের দরজা বন্ধ, জানালার গরাদেগুলি উপর-নিচে লম্বমান। জন্তুগুলিকে তাড়া দিলে বকগুলি বাহির হইয়া আসিবে, কচ্ছপগুলি আটকা পড়িবে। বকগুলি বাহির হইয়া পরবর্তী ঘরে ঢুকিল; এ ঘরের গরাদেগুলি যদি পূর্বঘরের ন্যায় খাড়াভাবে থাকে তো এ ঘর হইতে বকগুলি বাহির হইয়া আসিবে, আর তাহা না হইয়া উহারা যদি আড়াআড়ি ভাবে থাকে তাহা হইলে বকগুলি এ ঘরে আটকা পড়িবে। টুর্মালিন দ্বারা আলোকের যে ব্যাপার ঘটে, দৃশ্য আলোক ও অদৃশ্য আলোক যদি একজাতীয় হয়, তো অদৃশ্য আলোকেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যাইবে। জগদীশচন্দ্র তাঁহার যন্ত্রে ইহাও দেখাইলেন। দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে টুর্মালিন যাহা করে, তিনি দেখাইলেন, যে অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে বেশি কিছু নয়, বহু পৃষ্ঠাযুক্ত একখানি পুস্তক ঠিক তাহাই করিয়া থাকে। যে লণ্ঠন হইতে অদৃশ্য আলোক বাহির হইতেছিল তাহার সম্মুখে একখানি মোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার ধরা হইল, ক্যালেণ্ডারটি ধরা হইল লম্বালম্বি; ওদিকে কৃত্রিম চক্ষুর সম্মুখেও আর একখানি ক্যালেণ্ডার ঠিক একই ভাবে ধরা হইল; কৃত্রিম চক্ষুর কাঁটা ঘুরিল। কিন্তু প্রথম ক্যালেণ্ডারটি ঠিক রাখিয়া যেই দ্বিতীয় ক্যালেণ্ডারটি ৯০° ডিগ্রী ঘুরাইয়া আড়াআড়ি ভাবে ধরা হইল অমনি কৃত্রিম চক্ষু আর সাড়া দিল না, এখন দ্বিতীয় ক্যালেণ্ডার হইতে

কোন তরঙ্গ আর বাহির হইয়া আসিল না। দৃশ্য আলোক সম্বন্ধে টুর্মালিনে ঠিক এইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল।

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের শ্রেণীগত অভিন্নতার আর এক প্রমাণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। হার্জ যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার দৈর্ঘ্য ২০০-৫০০ মিটার। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যদি অদৃশ্য আলোক হয় তবে সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমপর্যায় হওয়া উচিত। জগদীশচন্দ্র যে তরঙ্গ সৃজন করিলেন তার দৈর্ঘ্য ৪ মিলিমিটার, দৃশ্য আলোকের পরবর্তী তাপ-তরঙ্গের একেবারে ঠিক প্রান্তবর্তী। চার মিলিমিটারে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে নামাইয়া আনাতে সংশয় দূরীভূত হইল।

দৃশ্য আলোক ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যে একজাতীয় জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নিঃসংশয়রূপে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিনা তারে বার্তা প্রেরণ

আলোক বিনা তারে বার্তা বহন করে, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিনা তারে কেন বার্তা বহন করিবে না?

যে কৃত্রিম চক্ষু জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করিলেন তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়িলে একটি বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তড়িৎ-নির্দেশক যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিয়া যায়। কিন্তু এই বিদ্যুৎ-প্রবাহ তো কাঁটা না ঘুরাইয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইতে পারে, বারুদের স্তূপে আগুন ধরাইতে পারে। অধিকন্তু ইটপাটকেলের মধ্য দিয়া যখন এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যায় তখন মধ্যের দেওয়াল ভেদ করিয়া তো পার্শ্ববর্তী ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধাবিত হইতে পারে; আর জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত কৃত্রিম চক্ষু তো খুবই কার্যকর, অত দূরে থাকিয়াও তো উহা সাড়া দিবে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উদ্ভূত হইল, মধ্যে দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করিতেছেন জগদীশচন্দ্রের পূর্বতন অধ্যাপক সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার লাফোঁ; ঘর ভেদ করিয়া পার্শ্ববর্তী অধ্যাপক পেডলারের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পৌঁছিয়া একটি পিস্তল ছুঁড়িল।

পৃথিবীতে বিনাতারে বার্তা প্রেরণের এই হইল সূচনা। এ বিষয়ে তিনি যে মার্কনির পূর্বগামী তাহা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জগদীশচন্দ্রকে লিখিত অধ্যাপক লাফোঁর পত্রের এই অংশ সেই সত্যকে বিঘোষিত করিয়াছে :

My dear Jagadish,

I would like to give a public lecture at St. Xavier College Hall on "Telegraphy without wires", but as the instruments you so kindly gave me are not in working order and as I would like to take this opportunity to vindicate your rights to priority over Marconi, would you assist me in my lecture with your presence and work your own instruments. Let me know as soon as possible as I intend inviting the Lieutenant-Governor...

Very sincerely yours,
(Sd) E Lafont S. J.

জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারকাহিনী সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারিত হইল এবং ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখাইলেন তাহাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দুইটি রুদ্ধ ঘর ভেদ করিয়া ৭৫ ফুট দূরে তৃতীয়

ঘরে পৌছিল এবং সেখানে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদ-স্তূপ উড়াইয়া দিল। ৭৫ ফুট :দূরে পাঠাইতে তিনি তাঁহার যন্ত্রের সহিত একটি উচ্চ দণ্ড সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই দণ্ডেব উপরিভাগে একখণ্ড টিনের চাকৃতি আটকাইয়া দিলেন। বর্তমান যুগে পরিবর্তিত আকারে এরিয়াল (aerial)এ এই ধবনের ব্যবস্থা কবা হইয়াছে। এইবার তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এক মাইল দূরে তাঁহার বাসভবনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে তাঁহাকে বিদেশযাত্রা করিতে হইল।

হার্জের পর পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবার নানারূপ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র সবার শীর্ষস্থান অধিকার কবিল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের ইলেকট্রিসিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হইল :

"বর্তমান সময়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণ করিবার যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত যন্ত্র তাহাদের সকলকে হটাইয়া দিল।"

এখানে একটা ঘটনাব উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার হেনরি জ্যাকসন ছিলেন তখন ব্রিটিশ রণতরীর অধ্যক্ষ। তিনি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিলেন কি করিয়া বিনা তারে এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে সংবাদ পাঠান যায়। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার কথা অবগত হইলেন এবং তাহা কাজে লাগাইতে চেষ্টিত রহিলেন। অবশেষে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা জাহাজের এক ধার হইতে অপর ধারে সংবাদ পাঠাইলেন। মার্কনি প্রবর্তিত যন্ত্র ইহার পরে দেখা দিল।

১৮৯৭ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি ইলেকট্রিক এন্‌জিনিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত হইল :

"যে সকল যুক্তির ধারা অবলম্বনে অধ্যাপক বসু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন সেই যুক্তি এবং সকল যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক বসুর যন্ত্র যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এই সত্য অতিশয় চমকপ্রদ। আশ্চর্য এই যে, এই যন্ত্র নির্মাণের কৌশল তিনি কোনদিন লুক্কায়িত রাখেন নাই এবং পৃথিবীর লোকের এই যন্ত্র কাজে লাগাইতে এবং তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে কোন বাধা নাই।"

ইহার পর জগদীশচন্দ্রের গবেষণা অন্য দিকে চলিয়া গেল এবং তাঁহার আবিষ্কারকাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি ; জয়মালাখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে-ধ্বনি গম্ভীরমন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগদীশচন্দ্র বসু রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার
আবিষ্কার বর্ণনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জড় ও জীবের সাড়া

জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী গবেষণা হইল, কিরূপে বাহিরের উত্তেজনায় প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় বিবিধ রকম সাড়া দেয়। কিন্তু বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি এইদিকে কিরূপে চলিয়া গেলেন, তাহা যদি আলোচনা করা যায় তো দেখা যাইবে যে, ইহার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের চিন্তাশক্তি একটা নির্দিষ্ট যুক্তির ধারায় চলিয়া গিয়াছে।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ার পরিমাণ অনেকক্ষণ কাজ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে ছোট হইয়া আসে। একবার দুইবার নয়, বার বার, প্রতিবারেই তিনি এইরূপ লক্ষ্য করিলেন। তবে কি প্রাণীর ন্যায় জড়েরও বাহিরের ধাক্কা খাইতে খাইতে একটা ক্লান্তি, একটা অবসাদ আসিয়া পড়ে? জগদীশচন্দ্র এখন এই আলোচনায় নিজেকে নিয়োজিত করিলেন।

কৃত্রিম চক্ষুর উপর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পড়িলে উহাতে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিতে থাকে তাহার মূলে আছে ঐ চক্ষু মধ্যস্থ পদার্থের আণবিক পরিবর্তন। জগদীশচন্দ্রের এই মত যখন জয়যুক্ত হইল তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই আণবিক পরিবর্তন যদি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা ঘটিয়া থাকে তো বাহিরের অন্য রকমের উত্তেজনায়ও উহার আণবিক পরিবর্তন সম্ভব এবং এই পরিবর্তনও সাড়ারূপে দেখা দিতে পারে। তখন তিনি জড়কে মাদক দ্রব্য, ক্লোরোফরম প্রভৃতি বিবিধ উত্তেজক পদার্থ দিলেন এবং তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সব যন্ত্র তিনি নির্মাণ করিলেন যাহা চালাইলে জড়,

উদ্ভিদ বা প্রাণীর সাড়ালিপি আপনা হইতে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। তিনি দেখিলেন, একখণ্ড টিন, একটি গাছের ডগা এবং ব্যাঙের একটি
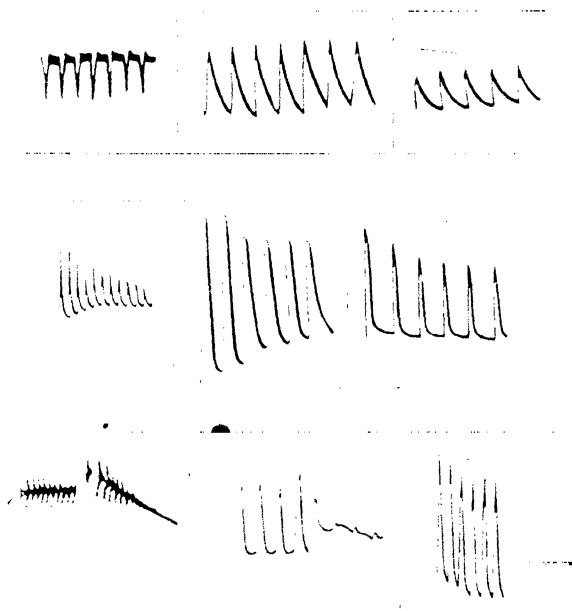
বাম দিকে : প্রাণীর সাড়া। মধ্যে : উদ্ভিদের সাড়া। দক্ষিণে : ধাতুর সাড়া
উপর হইতে নিচে : বিভিন্ন অবস্থায় উহাদের সাড়া

পেশী বাহিরের উত্তেজনায় অবিকল একইভাবে সাড়া দেয়। পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীকে তিনি এই পরীক্ষা দেখাইলেন। একই কল, একই লিখিবার যন্ত্র, কেবল এই উদ্ভিদ, পরমুহূর্তে প্রাণী, তাহার পর জড় কলে লিখিয়া চলিল। পরিশেষে এই লিপিগুলি দর্শকমণ্ডলীর হাতে দিলেন, কেহ চিনিয়া বলিতে পারিল না একটা জড়ের অপরটা

জীবের। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন :

"আলোকে ভাসন্ত ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত জীব ও আকাশে দীপ্যমান অসংখ্য সূর্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য যখন লক্ষ্য করিলাম, তখন আমার পূর্বপুরুষগণ তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভাগীরথীতীরে যে মহান্ সত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমার হৃদয়ংগম হইল— বিশ্বের এই নিয়তপরিবর্তনশীল অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখিতে পায়, সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।"

ইহার পর জগদীশচন্দ্র জীবের মধ্যে প্রাণীর ও উদ্ভিদের জীবনী-ক্রিয়া যে এক, বিবিধ পরীক্ষায় তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। এইখানে তাঁহার গবেষণার তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হইল।

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ-জীবন

জীবদেহের অনেক বৈচিত্র্য পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার সাধারণ নিয়ম দ্বারা মীমাংসিত হয় না দেখিয়া তদানীন্তন উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদগণ প্রাণীর অভ্যন্তরস্থ একটি বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করিতেন এবং জীবদেহের কার্য সম্বন্ধে যাহা কিছু অবোধগম্য তাঁহাদের এই কল্পিত শক্তির দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেন। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে জীবের সকল কার্যকলাপের সদুত্তর ইহা দিয়া মিলে না, তাহা ছাড়া আসল ভিতরকার কথা অন্ধকারেই থাকিয়া যায়। এই বিশ্বে শক্তির মধ্যে যে এত বড় একটা বিষম তারতম্য আছে, যে-শক্তি ভীষণ ঝঞ্ঝারূপে মহীরুহ, অট্টালিকা প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া, বিজয়ী সেনানীর মত নিজের প্রচণ্ডতা হতশ্রী পল্লীতে রাখিয়া যায় তাহা একটা অন্ধশক্তি, আর যাহার বলে অন্ধকার ঘরে প্রোথিত লতার একটা ডগা উন্মুক্ত বাতায়নের আলো ও হাওয়ার দিকে প্রসারিত হইয়া বর্ধিত হয়, তাহাতে একটি জাগ্রত শক্তি বর্তমান, বিশ্বে শক্তির এই বিভিন্নতা স্বীকার করিতে তাঁহার মন সাড়া দিল না। নানা দিক হইতে নানা পরীক্ষা দ্বারা তিনি দেখিলেন, পদার্থবিদ্যার অনুমোদিত জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়া জীবের মধ্যে একইভাবে কাজ করে, এমন কোন রেখা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না যেখানে বলা যায়, এই পদার্থবিদ্যার নিয়ম শেষ হইল এবং ইহার পর জীববিদ্যার ধর্ম আরম্ভ হইল।

কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ফরিদপুরের প্রণামকারী খেজুরগাছ

জগদীশচন্দ্র ফরিদপুরের একটি খেজুর গাছের সংবাদ পাইলেন। সূর্য অস্তাচলে গমন করিলে মন্দিরে যখন সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বালিত হয়, শঙ্খ-

কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে সমস্ত পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে, এই গাছটি তখন মস্তক অবনত করিয়া ভূমি স্পর্শ করে। আবার প্রভাতে নবোদিত সূর্যের প্রতি উন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রকৃতি যখন নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এই গাছও আকাশপানে তাহার মাথা তুলিয়া থাকে।

অনুসন্ধানে তিনি অবগত হইলেন যে এই খেজুর গাছটি মাটি হইতে একেবারে সোজা উঠে নাই। শিশু অবস্থায় একটা ঝড়ে কাত হইয়া যায়, তাই খানিকটা হেলিয়া গিয়া তাহার পর হঠাৎ একস্থানে মোচড় খাইয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে। গাছটা যেখানে বাঁকিয়াছে, মনে করা যাক, সেই স্থানটা কোনরূপে উত্তেজিত করা হইল, উত্তাপ দিয়া বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করিয়া বা আঘাত করিয়া। লজ্জাবতীর ন্যায় ইহার কোন গঠনবৈচিত্র্য না থাকায় বাহিরের সংকোচনজনিত ক্রিয়া চারিদিকে সমভাবেই হইবে, অতএব গাছ নড়িয়া সাড়া দিবে না। এই তো হইবার কথা। কিন্তু এই গাছটির তো গঠনবৈচিত্র্য আছে। এই খেজুর গাছের যে স্থানটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানে উপর দিকটা ক্রমাগত রোদ-ঝড়-জল খাইয়াছে, নিচেটা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত। ইহার ফলে উপর অপেক্ষা নিচেটা অপেক্ষাকৃত বেশি কোমল। সুতরাং বাহিরের উত্তেজনার ক্রিয়া নিচেই বেশি হইবে। তাই মধ্যাহ্নের উত্তাপ যখন ঐ স্থানটিকে উত্তেজিত করিল তখন তলা ও উপর ভিন্নভাবে সংকুচিত হইল; ফলে গাছের মাথাটি নামিয়া গেল। সুতরাং ঐ অংশে উপর-নিচের অবস্থার তারতম্যই গাছের উঠা-নামার কারণ এবং বাহিরের উত্তাপ দ্বারাই উহা সংঘটিত হইতেছে।

একটি বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা গাছের উঠা-নামা ও উত্তাপের পরিবর্তন পাশাপাশি লিখিত হইতে লাগিল। দেখা গেল দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ একই রকমের। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা গেল যে ঐ গাছের উত্থান-পতন কেবলমাত্র বাহিরের উত্তাপের বিভিন্নতা জনিত। সুতরাং যে গাছ

এইরূপ ভাবে জন্মায় যাহাতে করিয়া তাহার দুই দিক ভিন্ন অবস্থায় বর্ধিত হয়, সেই গাছই বাহিরের উত্তাপের তারতম্যে বাঁকিবে— তা উহা আমই হোক, জামই হোক বা খেজুরই হোক—সে গাছ ফরিদপুর বা রামপুরহাট যেখানেই জন্মাক না কেন। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ সংলগ্ন ঐরূপ গঠনের একটি খেজুর গাছে তিনি ফরিদপুরের ঐ খেজুর গাছের ন্যায় একই রকমের উঠা-নামা লক্ষ্য করিলেন।

কুমুদিনীর নিশিজাগরণ

কুমুদিনী রাত্রে প্রস্ফুটিত হয় দিনে মুদিয়া যায়, আর পদ্মের ব্যবহার ঠিক বিপরীত, ইহা লক্ষ্য করিয়া পূর্ববিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্পূর্ণভাবে তাহাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফল হইতে জগদীশচন্দ্র যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা এই :

টবশুদ্ধ একটি গাছকে কাত করিয়া গাছের ডালটিকে যদি মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখা যায় তবে দেখা যায় যে ডালটি বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ বাঁকিয়া উপরে উঠিবার শক্তি কোনো গাছে খুব বেশি কোথাও বা উহা খুবই কম।

অভিকর্ষের ক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিদ আলোকস্পর্শে পাতা উঠাইয়া নামাইয়া নানা রকমে সাড়া দিয়া থাকে। কোথাও পাতা বাঁকিয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হয়। আবার কোন গাছে উহারা আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতে থাকে। একটি মাদার গাছের পাতার উপর আলো ফেলা হইল, পাতাটি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, আলোক পাইবামাত্র মন পুলকিত হোক বা যাহাই হোক একমিনিট দেড় মিনিটের মধ্যেই উপর দিকে বাঁকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জাবতী এইরূপ অবস্থায় যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ ও আলোকজনিত উত্তেজনা, মাত্র এই দুইটি শক্তি যদি উদ্ভিদের উপর কাজ করিত তাহা হইলেও উহাদের সমবেত শক্তি গাছের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করিত। কোথাও একটি শক্তি অপরটির বিপরীত দিকে কাজ করিতেছে, কোথাও বা তাহারা পরস্পর সহায়তা করিতেছে, আর প্রত্যেক শক্তির পরিমাণ কত বিভিন্ন। সুতরাং কোন উদ্ভিদে এই দুইটি বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফল দেখিয়াই বলা চলে না কোন্ শক্তি কতটা কাজ কারতেছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা হইতে তিনি দেখিলেন যে কুমুদিনী অভিকর্ষের ফলে ফোটে না, আলোকের উত্তেজনায়ও নয়। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে উহা সন্ধ্যা ৬টার সময় খুলিতে আরম্ভ করে, এবং রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া যায় আর বেলা ১০টার সময় সম্পূর্ণভাবে বুজিয়া আসে। কুমুদিনীর দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ তবে কি বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্যের ফলে।

যে যন্ত্রে ফুলের নিদ্রা ও জাগরণ লিপিবদ্ধ হইতেছিল তাহার পাশে আর একটি যন্ত্র লাগান হইল যাহাতে দিবারাত্রির তাপ-পরিবর্তনের সংবাদ লিখিত হয়। দিনের পর দিন এইরূপ লিপিসাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতে লাগিল। পরে মিলাইয়া দেখা গেল যে দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ এক, মিশাইয়া দিলে চেনাই যায় না যে দুইটিতে দুইটি বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া একমাত্র বাহিরের তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়; এবং যে কারণে ফরিদপুরের খেজুর গাছ সন্ধ্যায় মাথা নোয়ায় এবং প্রাতঃকালে সোজা হইয়া দাঁড়ায় সেই একই কারণে পৃথিবীর সমস্ত কুমুদ রাত্রে বিকশিত হইয়া দিবসে সংকুচিত হইয়া পড়ে।

পরীক্ষায় আরও দেখিলেন যে, দিনের বেলায় কুমুদের চারিদিকে যদি

রাত্রের শৈত্য বজায় রাখা যায় তবে দিবসেও রাত্রের ন্যায় কুমুদ প্রস্ফুটিত থাকে, পক্ষান্তরে রাত্রে যদি উহার চারিদিকে দিনের উত্তাপ সমপরিমাণে রাখা যায় তো আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইলেও কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিবে না।

কিন্তু একটা কথা এই, কুমুদিনী যখন বিকশিতা তখন নলিনী মলিনী কেন, আবার কমলিনীর উন্মীলনে কুমুদিনী মুদ্রিতা কেন? বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্য কিরূপে দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাইতেছে?

একখণ্ড লৌহকে সমদীর্ঘ একখণ্ড তাম্রের সহিত যুক্ত করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল। তাপে উভয়ই বাড়িবে। কিন্তু সমতাপে তাম্র সমদীর্ঘ লৌহ অপেক্ষা বেশি বাড়ে, অথচ যুক্ত থাকায় প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বাড়িবার উপায় নাই; ফলে সমস্তটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে। যেটি বেশি বাড়ে সেটি থাকিবে বাহিরে, যেটি কম বাড়ে সেটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিক যদি আর একদিক অপেক্ষা বেশি বাড়ে তবে গাছটি বাঁকিতে থাকিবে আর পাতার একদিক আর দিকের অপেক্ষা বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মতো হইবে।

কুমুদের পাপড়ির বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিক অপেক্ষা বেশি নমনীয় সুতরাং উত্তাপে ভিতর অপেক্ষা বাহিরটা বেশি বাড়িবে, ফলে পাপড়িটা ধনুকের আকার লইবে, সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে, সুতরাং ফুলটি একেবারে মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরকম একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা অধিক কোমল, সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও পাপড়িটি বাঁকিবে, তবে এবার উহা উল্টা দিকে বাঁকিবে, সুতরাং বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে।

অতএব একই উত্তেজনা যে ভিন্নজাতীয় পুষ্পকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠনবৈচিত্র্যের ফলে।

নির্বাক জীবন

"ঘর হইতে বাহির হইলেই চারিদিক ব্যাপিয়া জীবনের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। সেই জীবন একেবারে নিঃশব্দ। শীত ও গ্রীষ্ম, মলয় সমীর, ঝটিকা, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, আলো ও আঁধার এই নির্বাক জীবন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত ও কত প্রকারের আভ্যন্তরিক সাড়া। এই স্থির, এই নিশ্চলবৎ জীবনপ্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে।

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোন হাত থাকিবে না, কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটি বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্তের মধ্যে কি প্রকারে তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখান যাইতে পারে? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্তিত হয়? আহার দিলে কিংবা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিংবা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তাহার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? কোন নার্ভ আছে কি? যদি থাকে তবে উহার উত্তেজনাপ্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়। কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহগতি বৃদ্ধি হয় কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিস্তব্ধ হয়? আমাদেব নার্ভের ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃ লিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে উদ্ভিদের কি তাহা আছে? স্বতঃস্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্বাপিত হয় সেই নির্বাণ-মুহূর্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্তে কি বৃক্ষ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?"

সসাড় ও অসাড় উদ্ভিদ

লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল প্রভৃতি কতকগুলি গাছ আছে তাহাদের গায়ে হাত দিলে বা উত্তাপ লাগাইলে ঐ সকল গাছের ছোট ছোট পাতা গুটাইয়া যায়, পাতার ডাঁটাও নামিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, আম, জাম গাছে এ রকম কিছু দেখা যায় না। এইসব দেখিয়া উদ্ভিদ-বিশারদ পণ্ডিতগণ উদ্ভিদকে 'অসাড়' ও 'সসাড়' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন যে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ভুল। প্রত্যেক গাছই বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; তবে যে নারিকেল, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদে ঐ সাড়া দেখা যায় না, আর লজ্জাবতীতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, নারিকেল, আম প্রভৃতির গঠন এইরূপ যে

উহাদের পক্ষে ডালপালা গুটান সম্ভব নয় উহাদের যেন হাত পা বাঁধা। কোন জন্তুকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করিয়া হাতপা ছুঁড়ে; এক বোবা জন্তুকে যদি হাত-পা বাঁধিয়া মারা যায় তবে তো সে কোন সাড়া দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু তাহার বেদনার অনুভূতি তো সমভাবেই প্রবল থাকে। উদ্ভিদ মাত্রই যদি বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় তবে কি উপায়ে উহা বুঝা যাইবে?

ইহার পূর্ব হইতে বিজ্ঞানী দেখিয়াছিলেন যে প্রাণিদেহের কোন স্থানে যদি আঘাত করা যায় তো একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সেই আহত স্থান হইতে চারিদিকে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদ-দেহেও জগদীশচন্দ্র এইরূপ সাড়ার অনুসন্ধান করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, কি লজ্জাবতী লতা, কি তাল তমাল, আঘাত করিলে প্রত্যেক উদ্ভিদে আহত স্থান হইতে সুস্থ স্থানে একটি তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হয় এবং আঘাতের মাত্রা যত বেশি হয় তড়িৎপ্রবাহ তত প্রবল হয়, প্রাণিদেহে যেরূপ হইয়া থাকে।

তড়িৎপ্রবাহরূপ পরোক্ষ সাড়া যেন সকল উদ্ভিদে সমান হইল, কিন্তু প্রত্যক্ষ সাড়া সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা যায় কেন। কেনই বা লজ্জাবতী পাতা নামিয়া সাড়া দেয় এবং আম জাম দেয় না। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে একটি লজ্জাবতী লতার যেখানে ডাল বাহির হইয়াছে তথায় পেশী একদিকে আছে; আহত হইলে পেশী সংকুচিত হয়, ডালটি নামিয়া পড়ে। সাধারণ বৃক্ষে ঐ স্থানে পেশী চারিদিকেই আছে। চারিদিক সমভাবে সংকুচিত হওয়ায় ডাল নামে না। তিনি একটি সাধারণ উদ্ভিদ লইলেন এবং ঐরূপ স্থানে পেশীর একদিক ক্লোরোফরম দিয়া অসাড় করিয়া দিলেন। এইবার পরীক্ষায় দেখাইলেন যে এই সাধারণ গাছ যাহাকে এতদিন অসাড় উদ্ভিদ বলা হইত, উহাও লজ্জাবতীর ন্যায় ডাল নোয়াইয়া সাড়া দেয়।

উদ্ভিদ ও নিম্নতম প্রাণীর সাড়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। প্রাণীমাত্রই বাহিরের যাবতীয় আঘাতে সর্বদাই বিক্ষুব্ধ, কেবল উদ্ভিদকে যেদিকে নাড়াও সে সেইদিকেই নড়িবে, যেদিকে বাড়িবার সে শুধু সেই দিকেই বাড়িবে, বহির্জগতের আঘাতের সাড়া দিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, কেবল লজ্জাবতীর ন্যায় কয়েকটি স্পন্দনকারী উদ্ভিদ ভিন্ন যাবতীয় উদ্ভিদই নীরব এবং এই নিঃস্পন্দতাই যেন উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম এই কথাই মনে করা হইত। কিন্তু উদ্ভিদকে কত অবস্থাপরম্পরার মধ্যেই না বাড়িতে হইয়াছে। নিয়তপরিবর্তনশীল আলো ও অন্ধকার, তাপ ও শৈত্য, পৃথিবীর আকর্ষণ, ঝঞ্ঝা, কতই না তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, কত ভাবেই না সে তাহার অন্তর্নিহিত বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে, কিন্তু মানবচক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই এমন সব সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল যাহার সাহায্যে উদ্ভিদ আপনি আপনার অদৃশ্য বেদনার কাহিনী নিজ হাতে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহা এমন ভাষায় লিখিবে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। সেই সব যন্ত্র যখন নির্মিত হইল কেবলমাত্র তখনই এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হইল যে শুধু লজ্জাশীলা লতা নয়, উদ্ভিদমাত্রই বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় অভিভূত হয়। আজ সেই লিপির সাক্ষ্যে আমরা বলিতে পারি যে, এই ভূমণ্ডলে শুধু যে প্রাণীই বাহিরের উত্তেজনায় আক্রান্ত হইয়াছে তাহা নয়, নীরব উদ্ভিদও সমভাবে উহা অনুভব করিতেছে এবং কতকাল কতযুগ ধরিয়া কত অশ্বত্থ বট কত তাল তমাল সেই আঘাত উত্তেজনার ইতিহাস নিজেদের দেহে বহন করিতেছে।

স্বতঃস্পন্দন

"মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীতে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনাআপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত

হইতেছে। কোন ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল ?

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দন ক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতিদ্রুতবেগে সম্পাদিত হয় কিন্তু ঢেউগুলি খর্বাকাব হয়। শৈত্যেব ফল ইহাব বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা ইহাদের স্বাভাবিক তাল বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়। ঈথর প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, বাতাস করিলে সেই অচেতন অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরম প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষ-প্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য রহস্য এই যে, কোন বিষে হৃদয়স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিঃস্পন্দিত হয। এইরূপ পরস্পরবিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে।

গাছেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় ?

বনচাঁড়াল গাছের ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনাআপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়-রূপে বলা যাইতে পারে।

প্রথমত পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নলদ্বারা উদ্ভিদ-রসের চাপ দিলে স্পন্দনক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে; তাহার পর দেখা যায় যে, উত্তাপে স্পন্দনসংখ্যা বর্ধিত, শৈত্যে

স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ঈথর প্রয়োগে স্পন্দনক্রিয়া স্তম্ভিত হয়, কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্যভাব দূর হয়। ক্লোরোফরমের প্রভাব মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে বিষদ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিঃস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষক্ষয় করা সম্ভব হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন উদ্ভিদপেশীতে আঘাত করিলে, সেই মুহূর্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া যে একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে অক্ষয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ অক্ষয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয়, তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে. সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃত পক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরুচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়; ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পরে বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই উহাতে শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাহিরের উত্তেজনার কাঙাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু যখন

তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।"

উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন

উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে যে রস গ্রহণ করে তাহার সমস্ত দেহে সেই রস সঞ্চারিত হয়। ইউক্যালিপ্টস বৃক্ষ প্রায় সাড়ে চারিশত ফুট অবধি উচ্চ হয়। শিকড় ভূমি হইতে যে রস গ্রহণ করে কোন্ শক্তি সেই রসকে ঊর্ধ্বে চারিশত পঞ্চাশ ফুট অবধি ঠেলিয়া তোলে? পদার্থ-বিজ্ঞানের কোন সাধারণ নিয়ম এখানে খাটে না।

জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে উদ্ভিদের দেহে যখন দ্রুত রস-সঞ্চালন হয় তখন তাহার পাতাগুলি খাড়া হইয়া উঠে, আবার যখন রস-সঞ্চালন আস্তে আস্তে হইতে থাকে তখন পাতাগুলি নুইয়া পড়ে। রসের সহিত উত্তেজক দ্রব্য মিশাইয়া দিলে রস-সঞ্চালন দ্রুত হইতে থাকে। তিনি দেখিলেন যে জীবদেহে এইসব ব্যাপার যেভাবে হয় উদ্ভিদেও ঠিক সেইরূপে হইতে থাকে। মানবের হৃৎপিণ্ডের সহিত কতকগুলি স্পন্দনশীল নার্ভ যুক্ত আছে, কেঁচো প্রভৃতি জীবের দেহে কতকগুলি লম্বমান তন্ত্রী আছে। গাছেও কি সেইরূপ কিছু আছে? থাকে তো গাছের মধ্যে কোথায় উহাদের অবস্থিতি? এ প্রশ্নের সমাধানে তিনি ব্যাপৃত রহিলেন।

তড়িৎপ্রবাহনির্দেশক গ্যালভ্যানোমিটার হইতে একটি তার আনিয়া যদি জীবদেহের ত্বকে যোগ করিয়া দেওয়া যায় এবং গ্যালভ্যানোমিটার হইতে আনীত অপর তারটি যদি জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ স্পন্দনশীল হৃৎপিণ্ডের সহিত যুক্ত হয় তো দেখা যায় যে, হৃৎপিণ্ড যেই সংকুচিত হয় অমনি গ্যালভ্যানোমিটারের একদিকে তড়িৎ যায়, আবার হৃৎপিণ্ডের প্রসারণের সঙ্গে তড়িতের প্রবাহ অন্যদিকে হয়; হৃৎপিণ্ডের সহিত

যোগ না করিয়া অন্য কোথাও যোগ করিলে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা নড়ে না। উদ্ভিদে কি এইরূপ কিছু হয়? ইলেকট্রিক প্রোব দিয়া জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করিলেন। ইলেকট্রিক প্রোব হইল একটি ছুঁচাল তার যাহার ডগাটা ছাড়া আর চারিদিক তড়িৎ-চালনে অক্ষম বস্তু দিয়া ঘেরা। উদ্ভিদের ত্বক গ্যালভ্যানোমিটারের একদিকে যোগ করিয়া দেওয়া হইল গ্যালভ্যানোমিটারের অপর প্রান্ত এই ইলেকট্রিক প্রোবের সহিত সংযুক্ত। এইবার এই ইলেকট্রিক প্রোব খুব ধীরে ধীরে গাছের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। কিছুই হয় না, কিছুই হয় না, হঠাৎ ঐ ডগাটা গাছের মধ্যে যেই এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল অমনি গ্যালভ্যানোমিটারের তড়িৎ সঞ্চালন দেখা গেল। এইখানে প্রোবটা রাখা হইল; দেখা গেল গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা একবার এদিকে একবার ওদিকে ক্রমাগত নড়িতেছে। ঠিক এইরূপই হইয়াছিল যখন জীবদেহের হৃৎপিণ্ডের সহিত গ্যালভ্যানোমিটার সংযুক্ত ছিল। তবে তো বলিতে হয় উদ্ভিদের দেহে ঐ স্তরে স্পন্দনক্রিয়া হইতেছে, জীবদেহের হৃৎপিণ্ডে যেরূপ হইয়া থাকে। আরও আশ্চর্যের বিষয় লক্ষিত হইল যে, যে-সব উত্তেজক দ্রব্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে দ্রুত করে, রসের সহিত সেই সব দ্রব্য মিশাইয়া দিলে উদ্ভিদের স্পন্দন বর্ধিত হয়, আবার বিষপ্রয়োগে ঠিক উল্টা ফল লক্ষিত হয়। আগেকার প্রোবটা এইবার আর একটু ঠেলিয়া দেওয়া হইল। জগদীশচন্দ্র দেখিলেন স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। সুতরাং উদ্ভিদের অভ্যন্তরে একটা বিশেষ স্তর, একটা বিশেষ রেখা আছে, যেখানে স্পন্দনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, ঠিক যেমন কেঁচোর দেহের হৃৎপিণ্ডের রেখা। আর এই স্পন্দনক্রিয়া, এই আকুঞ্চন-প্রসারণ, এই পাম্পিং (pumping) দ্বারা রস ৪৫০ ফুট কেন, যে-কোন উচ্চতায় উঠিতে পারে।

কিন্তু একটা আপত্তির কথা উঠিতে পারে। ঐ যে উদ্ভিদের দেহে

প্রোব চালান হইল তাহাতে উদ্ভিদের দেহ ক্ষত হইল এবং তজ্জন্য কিনা কি হইল। অবশ্য ক্ষত হইবার ফলে তড়িতের একবার এদিকে একবার ওদিকে যাইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না; কিন্তু তবুও এই হৃৎস্পন্দন ব্যাপারটা জগদীশচন্দ্র অন্যদিক হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই পরীক্ষায় গাছ সুস্থ অবস্থাতেই তাহার স্পন্দন জানাইল।

মনে করা যাক একটা রবারের নল আছে, সেই নলটা জলে ডুবান এবং সেই নলের মধ্য দিয়া জল পাম্প করা হইতেছে। যেই একবার জল যায় অমনি নলটা ফুলিয়া উঠে, জলের একটা ঢেউ চলিয়া যায়, আবার জল চলিয়া যাইবার পর নলটা সংকুচিত হইয়া পড়ে। আমি যদি এই নলে হাত দিয়া বসিয়া থাকি তবে ঐ নলের উঠা-নামা হইতে উহার ভিতরকার পাম্পিং ক্রিয়া ধরিতে পারি। জীবদেহে হৃৎপিণ্ড হইল সেই পাম্পিং স্টেশন এবং সেই পাম্পিং স্টেশনের সহিত কতকগুলি নল যুক্ত হইয়াছে। যেমন হৃৎপিণ্ডে পাম্পিং ক্রিয়া চলিতে থাকে অমনি এই নল, এই নাড়ীগুলি একবার ফুলিয়া উঠে, পরক্ষণে আবার চুপসিয়া যায়। সুতরাং এই নাড়ীর উঠা-নামা হইতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সঠিক অনুমিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে মানবদেহে একটা নাড়ী হাতের কব্জির কাছে শরীরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখানে এই নাড়ীটা টিপিয়া উহার উঠা-নামা দেখিয়া ভিতরকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

কিন্তু উদ্ভিদের নাড়ী তো কোথাও বাহিরে আসিয়া পৌছায় নাই। উহার উঠা-নামা কিরূপে ধরা যাইবে? আগেকার সেই রবারের নলটার কথা মনে করা যাক। ধরা যাক উহার চারিদিকে অনেকটা করিয়া ন্যাকড়া জড়ান আছে। তাহা হইলে রবারের নলটা যেমন ফুলিয়া উঠিবে অমনি ন্যাকড়া-জড়ানো এই সমস্ত জিনিসের বাহিরটাও ফুলিয়া যাইবে। অবশ্য রবারের নলটা যতটা ফুলিয়াছে এটা ততটা

নাও হইতে পারে। আবার রবারের নল চুপসিয়া যাইলে বাহিরটা একটু নামিয়া যাইবে। উদ্ভিদের মধ্যকার নাড়ীর যদি সংকোচন-প্রসারণ হয় তবে তাহার বাহিরটাও একটু-আধটু উঠা-নামা করার সম্ভাবনা
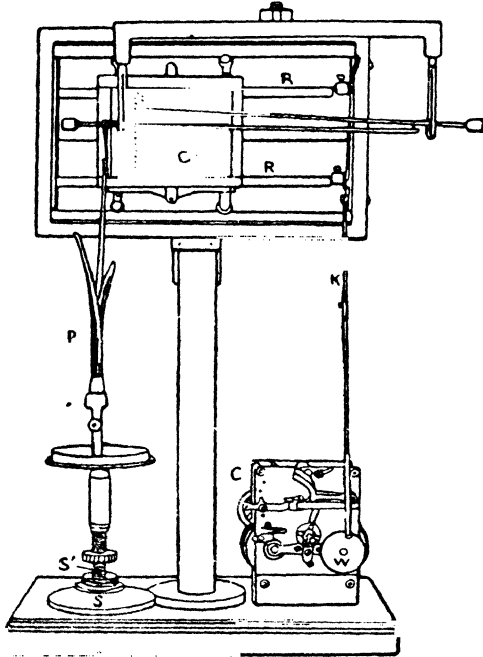
বৃদ্ধিমান যন্ত্র বা হাই ম্যাগ্নিফিকেশন ক্রেস্কোগ্রাফ

আছে। কিন্তু এ উঠা-নামা ধরা যাইবে কিরূপে? চোখে দেখা তো দূরের কথা, ক্ষমতাশালী অণুবীক্ষণেও উহা ধরা না যাইতে পারে।

এই সময় জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফ নামক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ক্রেস্কোগ্রাফ কোন গতিবিধিকে

কোটিগুণ বর্ধিত করিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দেয়। এই ক্রেস্কোগ্রাফের সাহায্য লওয়া হইল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল জীবের ন্যায় উদ্ভিদেরও হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে।

উদ্ভিদে নার্ভ-প্রবাহ

প্রাণিদেহের নার্ভের কার্য কি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, টেলিগ্রাফের তার যেমন দূর-দূরান্তর হইতে বৈদ্যুতিক সংকেত বহন করে, প্রাণীর দেহস্থ নার্ভ-জালের কার্যও অনেকটা সেইরূপ। দেহের কোন অংশে কোনপ্রকার উত্তেজনা প্রযুক্ত হইবামাত্র ঐ নার্ভ-জালই অণুপরম্পরায় সেই উত্তেজনা বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায় এবং মস্তিষ্ক আমাদিগের উত্তেজনার অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। সকল নার্ভই যে কেবল মস্তিষ্কে গিয়া শেষ হয় তাহা নয়, যেগুলি কোন সংকোচনশীল মাংসপেশীতে গিয়া শেষ হয়, তাহারা উক্ত পেশীতে উত্তেজনা বহন করিয়া লইয়া গেলে, উক্ত পেশী আকুঞ্চিত হইয়া সাড়া দেয়। নার্ভ ও পেশীর এই কার্য শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ ভেকের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া থাকেন। এইপ্রকার পরীক্ষায় ভেকের দেহস্থ বিশেষ বিশেষ অংশের নার্ভ এবং তৎসংলগ্ন পেশীকে কাটিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং পরে নার্ভের এক প্রান্তে কোন উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে, অপর প্রান্তস্থিত পেশী স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং নার্ভগুলিই যে উত্তেজনা বহন করিয়া লইয়া যায় তাহা এই পরীক্ষায় বেশ বুঝা যায়। দেহের কোন এক স্থানে আঘাত দিলে, সেই আঘাতে দূরবর্তী স্থানের স্পন্দন, প্রাণিদেহের বিশেষত্ব হইলেও উদ্ভিদে ইহার উদাহরণ একেবারে দুর্লভ নয়।

লজ্জাবতী লতার কোন ডালে আঘাত দিলে বা চিমটি কাটিলে, সেই আঘাতজনিত উত্তেজনা দূরবর্তী পাতাগুলি গুটাইয়া দেয়।

কিরূপে এই উত্তেজনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়? উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেন যে, আঘাতের ধাক্কা গাছের মধ্যস্থিত জলনালীর ভিতর দিয়া প্রেরিত হয়, উদ্ভিদের পত্রমূলে পৌছিলে পাতা বুজিয়া আসে।

জগদীশচন্দ্র এ মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে নিম্নলিখিত পরীক্ষা করিলেন:

১. উদ্ভিদের দেহের অবস্থা বিকৃত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া উত্তেজনা পরিচালনা এবং উত্তেজনার বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি নিরূপণ।

২. প্রাণীর নার্ভে বিষপ্রয়োগ করিলে যেমন তাহার ভিতর দিয়া উত্তেজনার চলাচল রোধপ্রাপ্ত হয়, উদ্ভিদের তাহা হয় কিনা, লক্ষ্য করা।

৩. চিমটি বা চাপ হইতেই জলের ধাক্কা। বিনা চাপ বা চিমটিতে বৃক্ষে উত্তেজনার উৎপন্ন করা যাইতে পারে কিনা।

উদ্ভিদ্‌দেহে উত্তেজনার বেগ খুব সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করার উপরেই পূর্বোক্ত বিষয়ের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। ইহার জন্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার সমতাল-তরুলিপি যন্ত্র (resonant recorder) নির্মাণ করিলেন। প্রচলিত যন্ত্রে লেখনীর মুখ নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপিফলকে সংলগ্ন থাকায় ক্ষীণ সাড়া লিখন উহাতে সম্ভব হইত না। এ যন্ত্রে সে অন্তরায় দূরীভূত হইল অথচ এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের এক ভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র সময় মাপিবার ব্যবস্থা ইহাতে রহিল। এই যন্ত্র সাহায্যে যে কেবল বৃক্ষের উত্তেজনাপরিচালনবেগ নির্ণীত হইল তাহা নয়, বৃক্ষ আপনা হইতে যন্ত্রের লিপিফলকে নিজের জীবনের যে সকল ইতিহাস লিখিয়া গেল, তাহা হইতেও বৃক্ষজীবনের অনেক নূতন কার্য মনুষ্যগোচর হইল।

জীব যখন আঘাত পায়, সে সেই মুহূর্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায়ে চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে এক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক

ভাগ সময় লাগে। উদ্ভিদ্‌দেহ এই প্রকারে আঘাত অনুভব করিবার জন্য কত সময় ক্ষেপণ করে, তাহা পূর্বে জানা ছিল না। তরুলিপি যন্ত্রের
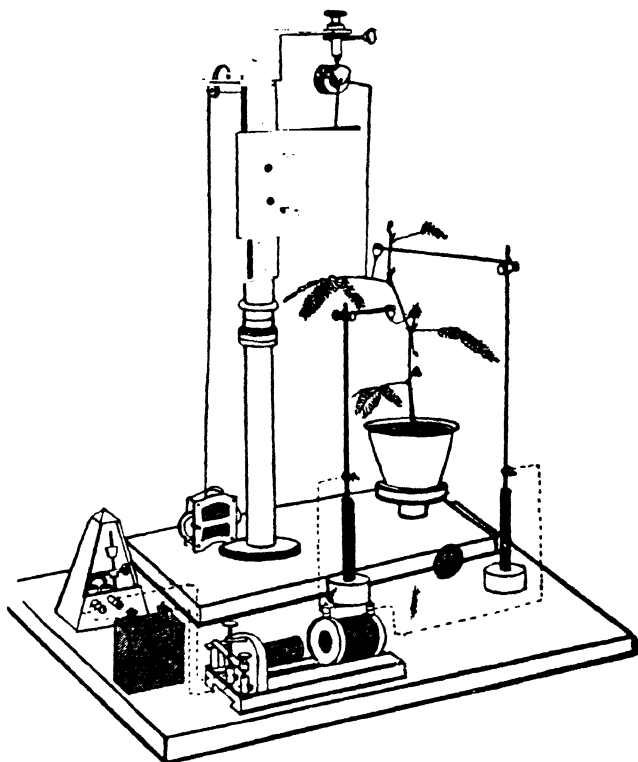
সমতাল-তরুলিপি যন্ত্র বা রেজোনাণ্ট রেকর্ডার

সাহায্যে অনুভূতিকাল নির্ণীত হইল। দেখা গেল একটি লজ্জাবতী লতা আঘাতপ্রাপ্তির পর এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ কাল

ক্ষেপণ করিয়া উত্তেজনা অনুভব করে। আমরা যখন খুব ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন কেনোপ্রকার তাড়না পাইলে শীঘ্র নড়াচড়া করিতে পারি না। সেইরূপ দেখা গেল, অবসন্ন অবস্থায় উদ্ভিদ উত্তেজনা বুঝিতে দীর্ঘ সময় লয়, কিন্তু বিশ্রামের জন্য আধ ঘণ্টা সময় দিলে, সেই উত্তেজনাই শীঘ্র অনুভব করিয়া ফেলে। এইবার বৃক্ষে উত্তেজনাবেগ মাপা হইল, দেখা গেল, এই বেগ মোটামুটি সেকেণ্ডে কুড়ি মিলিমিটার।

বৃক্ষের উত্তেজনাপ্রবাহ যদি নার্ভের ব্যাপার হয়, তাহা হইলে উষ্ণতায় ঐ বেগ বৃদ্ধি পাইবে শৈত্যে উহা হ্রাস হইবে; জলের ধাক্কা হইলে হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই হইবে না। জগদীশচন্দ্র এইবার এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা করিলেন। একটি পরীক্ষায় দেখিলেন যে, কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে উত্তেজনা বহন করিতে বৃক্ষটি ২২° ডিগ্রী উষ্ণতায় যে সময় লইয়াছিল ৩১° ডিগ্রী উষ্ণতায় তাহার অর্ধেকের কম সময় ক্ষেপণ করিল। অর্থাৎ দেখা গেল, উষ্ণতায় বৃক্ষের উত্তেজনা দ্রুততর বেগে ধাবিত হয়। শৈত্যে ইহার বিপরীত ক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন। এইবার বিষ প্রয়োগ করিলেন; দেখিলেন, পরিবাহনগতি একেবারে লুপ্ত হইল। নার্ভের কেনো অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিলেন; দেখিলেন, সেই অংশ দিয়া সংবাদ যাইতে পারিল না; বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল।

আর একটা ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কই বা মাগুর মাছের মাথা কাটিয়া ফেলিলে মৎস্যদেহ মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। কিন্তু মাংসপেশী অনেকক্ষণ সজীব থাকে। ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহে এই মৃতবৎ দেহ লম্ফপ্রদান করে। নার্ভ তড়িৎপ্রবাহে উত্তেজিত হয়। এ স্থলে বিনা চিমটিতেও উত্তেজনার সূচনা হয়। বৃক্ষেও যখন এই প্রকার উত্তেজনাপ্রবাহ চালনা করা সম্ভব হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা নার্ভের ব্যাপার। বৈদ্যুতিক উত্তেজনার আর একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, যে-স্থান দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ প্রবেশ করে,

সে-স্থানে উত্তেজনা প্রকাশ পায় না; পরন্তু যে-স্থান দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ বহির্গত হয় সেই স্থানই উত্তেজনার কেন্দ্র। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষায় দেখিলেন যে, লজ্জাবতী লতার একদিক দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে উত্তেজনার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্যুতের গতি উলটাইয়া দিলে পাতা উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া যায়।

যে-সব পরীক্ষা দ্বারা জলের ধাক্কা এবং উত্তেজনার প্রভেদ স্থির করা যায় জগদীশচন্দ্র সে সমস্ত পরীক্ষাই করিলেন। বিনা চিমটিতেও যে উদ্ভিদে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনার তরঙ্গ দূরে প্রেরিত হয় তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে-সব অবস্থার প্রভাবে প্রাণিদেহে উত্তেজনার বেগ বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় উদ্ভিদে আঘাতজনিত প্রবাহের শক্তিও সেই সব অবস্থার প্রভাবে ঠিক একই রূপে বাড়ে বা কমে। আহত প্রাণী এবং আহত উদ্ভিদ তাহাদের উদ্বেগবার্তা একই রূপে দূরে প্রেরণ করে।

মৃত্যুর সাড়া

"উদ্ভিদের জীবনে এইরূপ সময় আসে যখন কোন এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত! কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্তে স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া, কিংবা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা। মৃত্যুর রুদ্র আহ্বান যখন আসিয়া পৌছে, তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার

গতি পরিবর্তিত হয়, উধ্বর্গামী রেখা নিম্নদিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

"এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে। তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষা-হীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়া ছিল তাহা দূরীকৃত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।"

হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ করিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হ'তে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মরসাথে মানব-মর্মের আত্মীয়তা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

সংকলয়িতা শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

ইংরেজী

1. RESPONSE IN THE LIVING AND NON-LIVING.
   1902. Pp 199
2. PLANT RESPONSE AS A MEANS OF PHYSIOLOGICAL INVESTIGATION. 1906. Pp 781
3. COMPARATIVE ELECTRO-PHYSIOLOGY :
   A Physico-Physiological Study. 1907. Pp 760
4. RESEARCHES ON IRRITABILITY OF PLANTS.
   1913. Pp 376

5, 6, & 7. LIFE MOVEMENTS IN PLANTS: Transactions of the Bose Research Institute, Calcutta.

Vol	I parts 1 & 2, 1918	1918
Vol	II 1919	1919
Vol	III & IV : 1920, 1921	1923

8. PHYSIOLOGY OF THE ASCENT OF SAP; Bose Institute Transactions Vol V. 1923. Pp 277
9. THE PHYSIOLOGY OF PHOTOSYNTHESIS.
   1924. Pp 287
10. THE NERVOUS MECHANISM OF PLANTS.
    1926. Pp 224
11. COLLECTED PHYSICAL PAPERS. 1927. Pp 404

CONTENTS

I. On Polarisation of Electric rays by double refracting Crystals (*Asiatic Soc. Bengal*, May, 1895).

II. On a new electro-polariscope (*The Electrician*, Dec. 1895).

III. On double refraction of the electric ray by a strained dielectric (*The Electrician*, Dec. 1895).

IV. On the determination of the index of refraction of sulphur for the electric ray *Proc. Royal Soc.* Oct. 1895).

V. Index of refraction of glass for the electric ray (*Proc. Roy. Soc.* Nov. 1897).

VI. On the influence of thickness of air-space on total reflection of electric radiation (*Proc. Roy. Soc.* Nov. 1897).

VII. A simple and accurate method of determination of the Index of refraction for Light (*Unpublished Paper.* Nov. 1895).

VIII. On the selective conductivity exhibited by certain polarising substances (*Proc. Roy. Soc.* Jan. 1897).

IX. Electro-Magnetic radiation and the polarisation of the electric ray (*Friday Evening Discourse*, Royal Inst. Jan. 1897).

X. The rotation of plane of polarisation of electric waves by a twisted structure (*Proc. Roy. Soc.* March 1898).

XI. The production of a "dark cross" in the field of electro-magnetic radiation (*Proc. Roy. Soc.* March 1898).

XII. On a self-recovering Coherer and the study of cohering action of different metals (*Proc. Roy. Soc.* April 1899).

XIII. On electric touch and the molecular changes produced in matter by electric waves (*Proc. Roy. Soc.* Feb. 1900).

XIV. On the continuity of effect of light and electric radiation on matter (*Proc. Roy. Soc.* June 1901).

XV. On the similarities between radiation and mechanical strains (*Proc. Roy. Soc.* June, 1901).

XVI. On the strain theory of Photographic action (*Proc. Roy. Soc.* June, 1901).

XVII. On the change of conductivity of metallic particles under cyclic electromotive variation (*Brit. Asso. Glasgow*, 1901).

XVIII. On the similarity of effect of electrical stimulus on Inorganic and Living substances (*Congress of Science, Paris.* 1900).

XIX. The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus (*Friday evening discourse, Royal Inst.* 1901).

XX. Electromotive wave accompanying mechanical disturbance in metals in contact with electrolyte (*Proc. Roy. Soc.* May 1902).

XXI. Electric response in ordinary plants under mechanical stimulation (*Journal Linnean Society*, 1902).

XXII. The Quadrant Method of Response to stimulus of Light (from *Life Movements in Plants*, 1923).

XXIII. On a vegetable photo-electric cell (from *Life Movements in Plants* 1923).

XXIV. The Photosynthetic Recorder (from *Physiology of Photosynthesis*, 1925).

XXV. The self-recording Radiograph (from *Life Movements in Plants*, 1923).

XXVI. The High Magnification Crescograph (*Proc. Roy Soc.* October 1917).

XXVII. The Magnetic Crescograph and the Magnetic Radiometer (from *Physiology of Photosynthesis*, 1924).

XXVIII. The Resonant Recorder (*Phil. Trans.* 1912 ; *Irritability of Plants* 1913).

XXIX. General Summary.

12. THE MOTOR MECHANISM OF PLANTS. 1928. Pp 429

13. PLANT AUTOGRAPHS AND THEIR REVELATIONS. 1927. Pp 231

14. GROWTH AND TROPIC MOVEMENTS OF PLANTS. 1929. Pp 447

15. TRANSACTIONS OF THE BOSE RESEARCH INSTITUTE Vol VI, 1930 and 1931. 1932

Transactions of the Bose Research Institute Vol. VII (1931-32) ও Vol. VIII (1932-33)এ জগদীশচন্দ্রের একটি করিয়া প্রবন্ধ আছে, যথা— "Capture of fish by drugging a stream" (Vol VII); The Possibility of differential effects on certain fishes by water distentance and by vegetable extracts" (Vol VIII),

বাংলা

অব্যক্ত। আশ্বিন ১৩২৮। পৃ. ২৩৪

"চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত তাহার দু-একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।" এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত আছে :

যুক্তকর ; আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ ; গাছের কথা ; উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু ; মন্ত্রের সাধন ; অদৃশ্য আলোক ; পলাতক তুফান ; অগ্নিপরীক্ষা ; ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ; বিজ্ঞানে সাহিত্য ; নির্বাক জীবন ; নবীন ও প্রবীণ ; বোধন ; মনন ও করণ ; রানী-সন্দর্শন ; নিবেদন ; দীক্ষা ; আহত উদ্ভিদ , স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ ; হাজির।